করোনা ও ভারত : গণ টিকাকরণের দাবি নিয়ে সংশয় জরুরি

সৌভিক ঘোষ ও অনির্বাণ সাহা

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ :

১. এই অতিমারীর সময়ে কম বেশি সকলেই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। অনেকে প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, অনেকেই প্রিয়জনকে হারানোর আশংকা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকের কাছেই টিকা একমাত্র ভরসার জায়গা। মনের এই অবস্থায় নিরপেক্ষ যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা শক্ত, পড়তেও ভাল লাগার কথা নয় বিশেষত যেখানে আরও ভাল কোনও সমাধান সুনির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ নেই। মানুষের যাপন আবেগবর্জিত নয় তাই এই মানসিক অবস্থাকে সম্মান করেই নিচের আলোচনা বিপর্যস্ত মন নিয়ে না পড়াই ভাল হবে।

২. নানা ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত মতগুলোর সমালোচনা করলেও কোনরকম ষড়যন্ত্র- তত্ত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমরা কোভিড অতিমারী, টিকাকরণ বা লকডাউনের মত পদক্ষেপকে সামগ্রিক চক্রান্ত বলে মনে করছি না। চীন / আমেরিকা / মোদি / বিল গেটস / কর্পোরেট কোম্পানি ইত্যাদি কেউই সামগ্রিকভাবে এসবের পেছনে আছে বলে আমরা মনে করছি না (যদিও এরা প্রত্যেকেই অতিমারীর সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে এই নিয়েও আমাদের কোনও সন্দেহ নেই)। ষড়যন্ত্র- তত্ত্ব ধরনের লেখার প্রতি যাদের আগ্রহ আছে নিচের লেখা তাদের জন্যও নয়।

অতিমারীর "দ্বিতীয় ঢেউ" এর ধাক্কায় সারা দুনিয়ার মত ভারতেরও চিকিৎসা কাঠামো বিধ্বস্ত। অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারত সরকারের হাতে মূলতঃ দুটোমাত্র রাস্তা এই মুহূর্তে আছে আছে বলে সরকারের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ মহলের মত। প্রথমটা হল আংশিক বা পুরো লকডাউনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার গতিতে খানিক রাশ টানার চেষ্টা, যেটা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টা হল একটা বড় অংশের লোককে টিকা দিয়ে তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভবনা কমিয়ে আনা।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, কোভিড সংক্রমণ এবং কোভিড আক্রান্ত হওয়া দুটি ভিন্ন পরিস্থিতি। নানা দেশের রক্তসমীক্ষা দেখায়, অন্যান্য নানা ভাইরাস সংক্রমণের মতোই, নয়া-কোভিড ভাইরাসেও সংক্রমিত হচ্ছেন প্রচুর মানুষ, কিন্তু তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ-কে আক্রান্ত বলা যায় না, কারণ তাদের শরীরে আক্রান্ত হবার কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি, সহজ করে বললে শরীর খারাপ হয়নি, অতএব তারা বুঝতেও পারেননি যে সংক্রমিত হয়েছেন। যারা আক্রান্ত, তাদের মধ্যেও একটা অল্প অংশ (১০ শতাংশের মতো) মানুষকে হাসপাতাল পরিষেবা নিতে হচ্ছে। কে সংক্রমিত হবেন শুধু, কে আক্রান্ত-ও হবেন,

এবং কাকে হাসপাতাল পরিষেবাও নিতে হবে -- এটা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা আন্দাজ তৈরি করা যাচ্ছে। ঠিক যেমন বর্ষাকালে প্রতিদিনই বৃষ্টির সম্ভবনা আছে বলা যায়, কিন্তু ধরা যাক এই বছরের জুন মাসের শেষ দিন বৃষ্টি যে হবেই সেটা বলা যায় না। আবার শীতকালে কোনোদিনই বৃষ্টির সম্ভবনা নেই বলা যায়, কিন্তু এই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন বৃষ্টি যে হবেই না সেটা আগে থেকে বলা যায় না। যাই হোক, আন্দাজগুলো হল – কমবয়সীদের দেহে সংক্রমণ হলেও আক্রান্ত হবার সম্ভবনা কম কারণ বয়সের সাথে সাথে দেহের সহজাত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। (এখানে খেয়াল করতে হবে যে আমরা অসুখ হবার সম্ভাবনা কম বলছি এবং একটা তুলনামুলক অবস্থান থেকে বলছি, সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা কম বা অসুখটা হলে ঝুঁকি নেই এমন কথা বলছি না। তথাকথিত দ্বিতীয় ঢেউ-তে কম বয়সীরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন বলে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা নানা কারণে হতেই পারে, সরাসরি এমন কোনও যুক্তি বা গবেষণা নেই যা বলছে যে নতুন করে একটা বিশেষ কোনও বয়সীদের সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা বেশি।) -- যাদের নানা ধরনের শরীর খারাপ রয়েছে আগে থেকেই (রক্তে শর্করা, মধুমেহ, ফুসফুসের সমস্যা, হৃদযন্ত্রে সমস্যা, মেদ, উচ্চরক্তচাপ, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব) তাদের সংক্রমণ থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভবনা বেশি এবং একই সাথে তাদের হাসপাতাল পরিষেবা নেবার সম্ভবনাও বেশি। কারণ, সংক্রমিত থেকে আক্রান্ত হবার এবং শারীরিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হবার একটা বড়ো দিক হল শরীরে ভাইরাস ঢুকে পড়ার পরে শরীরের সহজাত প্রতিরোধ-ব্যবস্থার পাল্টা আক্রমণ বা প্রদাহ (পরিভাষায় সাইটোকাইন ঝড়) যা শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের (ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদি) রক্তকোষ ও অন্যান্য কোষগুলিকেও ভুল করে আক্রমণ করে বসে ও মেরে ফেলে এবং তাতে নানা অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি হয় যা আগে-থেকে-শারীরিক-দুর্বলতা-থাকা মানুষকে আরও বেকায়দায় ফেলে। এছাড়াও আরেকটি আন্দাজ হল -- আক্রান্ত হওয়াটা ঠিক সময়ে চিহ্নিত না হলে এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও বিশ্রামাদি না পাওয়া গেলে হাসপাতাল পরিষেবা নিতে হতে পারে। কারণ, যে কোনো ভাইরাসজনিত অসুখের মতো এই অসুখেরও লাঘব করার ব্যবস্থাপনা (পরিভাষায় প্যালিয়েটিভ ম্যানেজমেন্ট) খুবই জরুরি যাতে শরীর ধীরে ধীরে ভাইরাসটিকে বিদেয় করতে পারে নিজেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

পৃথিবীর ধনী ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত এবং অতিমারীসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্য দেশের বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মুখাপেক্ষী নয় এরকম দেশগুলির একাংশ (আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ইজরায়েল, ব্রিটেন) গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই দ্রুত টিকাকরণের মাধ্যমে এই অতিমারী এবং নয়া-কোভিড ভাইরাসের আক্রমণের মোকাবিলার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যখন জানা যেতে শুরু করে যে এই ভাইরাস অন্যান্য ফ্লু ভাইরাসের মতোই রূপবদল করলেও তা সাধারণ ফ্লু ভাইরাসের মতো অত দ্রুত করে না, একটু বেশি সময় লাগে। এবং একইসাথে যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, নজরদারি (পরিভাষায় টেস্ট-ট্র্যাক-ট্রিট) ও লকডাউনের যুগলবন্দীতে ভাইরাসটিকে এলাকাছাড়া করা সম্ভব না, একমাত্র চীনের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ছাড়া বা নিউজিল্যান্ডের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছাড়া কোথাও তা স্বল্পমেয়াদীভাবেও সফল নয়। ভালো টিকা তৈরি, তা সে মৃত বা অপ্রাসঙ্গিক ভাইরাসের দেহকে ভিত্তি করে হোক বা ল্যাবরেটরিতে বানানো ভাইরাসের দেহাংশকে ভিত্তি করে হোক, সময়সাপেক্ষ। কারণ, তা স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থে মানবশরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কি না এবং তা আদৌ ভাইরাসগুলিকে আটকাতে সক্ষমতা প্রদান করছে কি না শরীরকে, তা ল্যাবরেটরিতে যতই প্রমাণ করা যাক, বাস্তবে মানবদেহে ঢুকে সে কতটা কী করতে পারবে এবং পারবে না -- তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। সেই জন্যই প্রয়োজন হয়

ট্রায়াল-এর। কিন্তু অত সময় নেই। তাই পরীক্ষামূলক স্তরে থাকা টিকাগুলিকে জরুরিভিত্তিতে ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া শুরু হয়ে যায়। চীন রাশিয়া আমেরিকা ইজরায়েল ব্রিটেন -- মোটামুটি সবাই গত বছর শেষ হতে না হতেই টিকাকরণ শুরু করে। আমেরিকা ইজরায়েল ব্রিটেন -- এই তিনটি দেশে টিকাকরণ খুব উল্লেখযোগ্য, কারণ এরা কোমরবেঁধে শুরু করে তখন যখন তথাকথিত "দ্বিতীয় ঢেউ" এদের দেশগুলিকে ঝাপটা মারছে "প্রথম ঢেউ" এর চেয়েও সজোরে।

এই অবস্থায় আমাদের দেশেরও নানা প্রভাবশালী মহল থেকে খুব দ্রুত এবং বিনামূল্যে গণ টিকাকরণ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে বা চাপ বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি সংসদীয় বিরোধী দল এই বিষয়ে খুবই সহমত। খুব দ্রুত গণ টিকাকরণ নিয়ে সরকারপক্ষের দ্বিমত নেই, যদিও বাস্তব উদ্যমের ও উপায়ের অভাব খানিকটা দেখা যাচ্ছে। যেমন টিকার যোগানের অভাব, বন্টনে অসামঞ্জস্যতা, টিকাকরণ কেন্দ্রের অভাব, সার্বিক ভাবে একটা সমন্বয়ের অভাব। সমন্বয় ভাল করার জন্য যে কো-উইন চালু করা হয়েছিল তা বাস্তবে কাজে আসছে না। আর বিনামূল্যে সবাইকে টিকা দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার একরকম দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে, তবে অনেক রাজ্য সরকার বিনামূল্যেই টিকা দেবার আশ্বাস অন্ততঃ দিয়েছে। ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার একটা দেশে এই ধরনের জনমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেমন অনেক সমস্যা আছে, তেমনি যে কোন মুল্যে সেই সব সমস্যাকে পেরিয়ে আসার প্রবণতাকেও ভাল করে বিচার করে দেখা দরকার। এই মর্মেই নীচের আলোচনা -- কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

গণ টিকাকরণ কেন?

যে কোন অতিমারীর প্রকোপ কমে আসার জন্য একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বড় অংশের (৫০-৭০%) সংক্রমণের বিরুদ্ধে একটা অনাক্রম্যতা অর্জন করতে হয়। কোনও কোনও সময় সেটা প্রাকৃতিক নিয়মেই খুব দ্রুত হয়ে যেতে পারে। যেমন সংক্রমণ যদি ছড়িয়ে পড়ে কোনো একটা ভৌগলিক অঞ্চলে (কোনো একটা পাড়া বা বস্তি, কোনো একটা শহর বা গ্রাম, কোনো একটা রাজ্য বা এমনকি কোনো একটা দেশ) ব্যাপকভাবে, সেক্ষেত্রে নানা রক্তসমীক্ষায় দেখা যায় যে সেই ভৌগলিক অঞ্চলের বেশিরভাগেরই শরীরে সংক্রমণ পরবর্তী প্রতিরোধক্ষমতার প্রমাণ। ভাইরাস যেহেতু দেহের বাইরে খুব অল্প সময় বাঁচে (বা সক্রিয়তা ধরে রাখতে পারে), তাই সংক্রমণের প্রসার ঘটে মূলতঃ মানুষের থেকে মানুষে। একটা বড়ো অংশের শরীরে সংক্রমণ পরবর্তী প্রত্যক্ষ প্রতিরোধক্ষমতা থাকার মানে হল, সে আর ওই ভাইরাসের ‘বাহক’ হতে পারবে না। তাই সে যেমন আর আক্রান্ত হবে না, তেমনি সে ছড়াতেও পারবে না। তখন বলা হয়, ওই অঞ্চলে একধরনের গোষ্ঠীগত প্রতিরোধক্ষমতা বা গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়েছে। তখন ওই অঞ্চলে নতুন আক্রান্ত হবার ঘটনাও খুবই কমে যায়। টিকাকরণ করে মূলতঃ এই গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জন করার কাজটা কৃত্রিম ভাবে খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় নানা কারণে সেই ভৌগলিক অঞ্চলের বেশিরভাগ লোকের মধ্যে ছড়ায়নি। সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা বড় অংশের লোকের টিকাকরণ করে এই গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা তৈরি করে দিতে পারি তাহলে ভাইরাস ছড়ানোর মত লোক না পেয়ে নিজেই ধীরে ধীরে একরকম মুছে যাবে, অন্ততঃ অতিমারী পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসব। প্রাকৃতিক

গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জনের চেয়ে কৃত্রিমভাবে টিকাকরণের মাধ্যমে গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জনকে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণ হল -- এতে প্রাকৃতিকভাবে গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জনের যে আবশ্যিক বিপদ -- প্রচুর মানুষ আক্রান্তও হবে এবং তার একটা অংশকে হাসপাতালে যেতে হবে এবং তারও মধ্যে একটা অংশ মারা যেতেও পারে; এই বিপদ এড়ানো যায় কৃত্রিম টিকাপদ্ধতি অবলম্বন করলে।

কোভিড-এর গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা কি প্রাকৃতিক উপায়ে অর্জন করা যাবে না?

সরকারি হিসেবে এখনো পর্যন্ত দেশের ৩% মানুষ 'কেস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অর্থাৎ এক বা একাধিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের কোভিড বা করোনা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংখ্যাটা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে ধরলেও তা ৫০-৬০% থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানটি সত্যের থেকে বহু দূরের, এমনকি তাকে মিথ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ অসুস্থ অনেকেই, বিশেষতঃ আর্থিকভাবে যারা দুর্বল এবং/অথবা গ্রামে থাকেন, যা আমাদের দেশের জনসংখ্যার নিরঙ্কুশ সিংহভাগ, তারা পরীক্ষা করাচ্ছেন না বা করাতে পারছেন না। তারা আক্রান্ত হলেও সরকারি পরিসংখ্যানে নেই। এছাড়াও একটা বড়ো অংশ আছে যেনারা সংক্রমিত কিন্তু আক্রান্ত নন অর্থাৎ শরীর খারাপ হয়নি সংক্রমিত হওয়া সত্ত্বেও। গত বছরের নানা রক্তসমীক্ষায় দেখা গেছিল প্রকৃত সংক্রমিত-র সংখ্যা একটি ভৌগলিক অঞ্চলে সরকারি পরিসংখ্যানের ১০ থেকে ১০০ গুণ।[i] সেই হিসেবে এতদিনে আমাদের দেশে প্রাকৃতিকভাবেই গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু, এখানে কয়েকটি কিন্তু আছে। ১) এর ভেতর যাদের শুধু সংক্রমণ হচ্ছে এবং যারা আক্রান্ত হলেও খুব হাল্কা অসুখ হচ্ছে (যে সংখ্যাটা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে বিচার করলেই প্রায় ৭০% সরকারি পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা মাথায় রাখলে অনেক অনেক বেশি), তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রত্যক্ষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (পরিভাষায় অ্যান্টিবডি) তৈরি হচ্ছে কিনা তাই নিয়ে একটা সংশয় আছে।[ii] ২) আবার এই প্রত্যক্ষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতারও লয় আছে। ফলতঃ যারা বেশ অসুস্থ হচ্ছেন, পরিণামে যথেষ্ট পরিমাণ প্রত্যক্ষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছেন, তাদেরও সেই ক্ষমতা কমে আসছে সময়ের সাথে সাথে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, একবার যারা কম-বেশি অনাক্রম্যতা পেয়ে যাচ্ছেন তাদের অনাক্রম্যতাও সময়ের সাথে সাথে (৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে) ফিকে হয়ে আসছে।[iii] ৩) এছাড়া সাধারণ মরশুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অত দ্রুত না হলেও কোভিড বেশ তাড়াতাড়ি নিজেকে বদলে নিতে পারে তাই ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা নয়া রূপ (পরিভাষায় মিউটান্ট স্ট্রেইন) ছড়িয়ে পড়ছে যাদের ক্ষেত্রে আগেকার অবশিষ্ট অনাক্রম্যতা ভালো কাজ করছে না। ৪) তাছাড়া সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ও সংক্রমিত হওয়া আটকাতে যে উদ্যোগ এবং সতর্কতা গুলি নেওয়া হচ্ছে, যেমন লকডাউন, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদির ফলেই হোক বা ভাইরাসটির কোনো একটা ভৌগলিক অঞ্চলে সক্রিয়তার নিজস্ব উত্থান-পতন চক্রের কারণেই হোক -- প্রায় কোনো "ঢেউ" -ই সেই পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না (তিন চার মাসের বেশি না) যা একটি ভৌগলিক অঞ্চলের একটা বড়ো অংশকে (পরিভাষায় ক্রিটিকাল মাস) সংক্রমিত তথা পরিণামে রোগ-প্রতিরোধক্ষম করতে পারে।[iv] কাজেই দেখাই যাচ্ছে যে গোটা দেশে অনাক্রম্যতা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি নাও হতে পারে। তবে একটা ছোট এলাকায় (একটি বস্তি, একটি পাড়া, এমনকি একটি সংহত শহর) সম্ভবতঃ এই গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা সাময়িকভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে।[v] দেখা যাচ্ছে

কিছুদিন পর থেকে ছোটো এলাকায় সংক্রমণের মাত্রা কমে আসছে ও শেষে প্রায় নেই হয়ে যাচ্ছে, এটা সম্ভবত স্থানীয় ভাবে তৈরি হওয়া গোষ্ঠী অনাক্রম্যতার ফল। বলা যায়, গোটা দেশ জুড়ে গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা সমসাময়িকভাবে ও সমানভাবে তৈরি না হলে আমরা একের পর এক তথাকথিত ঢেউ দেখতে পাব।

টিকা দিয়ে কি গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা অর্জন করা যাবে?

এই ব্যাপারটা এখনো পুরো স্বচ্ছ নয়। একদিকে যেমন নানা জনস্বাস্থ্য গবেষণা (এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি) দাবি করছে যে দ্রুত টিকা দিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে তেমনই প্রাকৃতিক অনাক্রম্যতা-র মত টিকা থেকে তৈরি অনাক্রম্যতারও সমস্যা থাকছেই। প্রথমতঃ টিকা দিয়ে তৈরি অনাক্রম্যতাও স্থায়ী নয়, প্রাকৃতিকের মতোই টিকা থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ রোগ-প্রতিরোধক্ষমতাও সময়ের সাথে সাথে কমে আসে।[vi] দ্বিতীয়তঃ এই অনাক্রম্যতাও অন্ততঃ কিছু নতুন রূপ-কে (মিউট্যান্ট স্ট্রেইনকে) সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে পারে না বলে গবেষণায় পাওয়া যাচ্ছে।[vii] তবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে টিকা যথেষ্ট মাত্রার অনাক্রম্যতা তৈরি করতে পারছে সেক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক ভাবে যে সময় লাগার কথা তার অনেক আগেই যথেষ্ট সংখ্যক লোককে টিকা দিয়ে গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা তৈরি করা যাবে। তাছাড়া যদি টিকা অসুখের জটিলতা কমিয়ে দিতে পারে, ভাইরাসটিকে শরীরের সহজাত প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কাছে আগামভাবে পরিচিত করে দিয়ে এবং পরিণামে সহজাত-প্রতিরোধব্যবস্থার ভুল লক্ষ্যে আঘাতের সম্ভবনাকে কমিয়ে দিয়ে অর্থাৎ প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে অনেক কম লোকের হাসপাতালে যাবার দরকার পড়বে, মৃত্যুহারও অনেক কমিয়ে দেওয়া যাবে।[viii] মূলতঃ: এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই বিজ্ঞানীরা খুব দ্রুত অনেককে টিকা দিয়ে দেওয়ার সপক্ষে মত দিচ্ছেন অতিমারীর মোকাবিলায়, বেশ খানিকটা আন্দাজের ওপর ভিত্তি করেই। এই আন্দাজের সপক্ষে তাদের হাতে যে যে তথ্যগুলি আছে তা হল -- ১) কোভিড ভাইরাসটির আদি চিনা রূপটির বিরুদ্ধে টিকাগুলির কার্যকরীতার ল্যাবরেটরি তথ্য ২) কিছু নয়া রূপের বিরুদ্ধে টিকাগুলির কম-বেশি কার্যকরীতার ল্যাবরেটরি তথ্য[ix] ৩) টিকার কার্যকরীতা ব্যাপারটা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা ৪) ইজরায়েল, ব্রিটেন ও আমেরিকায় টিকাগ্রহিতাদের মধ্যে আক্রান্ত কম হওয়ার জনস্বাস্থ্য সমীক্ষা লব্ধ তথ্য (যদিও সরকারি উদ্যোগে করা মূলতঃ)।[x]

যথেষ্ট সংখ্যক টিকাকরণ করলেই কি কাজ হবে?

না। যেহেতু টিকা থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা অনাক্রম্যতাও ৬ মাস থেকে ১ বছর মত স্থায়ী হবার সম্ভবনা (এবং প্রথম ডোজ-এর কার্যকারীতা খুব দ্রুত কমে যায়) তাই যথেষ্ট লোককে টিকা দিলেই হবে না, দিতে হবে খুব অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই। না হলে একদল অনাক্রম্যতা পেতে পেতে অন্যদলের অনাক্রম্যতা হারিয়ে যাবে।[xi] গোটা দেশে টিকাজাত গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা আমরা পাব না। তা ছাড়া ভাইরাস যথেষ্ট বদলে গেলে, যেটা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার হয়েছে, টিকা থেকে পাওয়া গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা কোনও কাজেই নাও লাগতে পারে। সব কিছু প্রত্যাশা মত চললেও প্রত্যেককে আগামী কয়েকবছর ধরে টিকা দিয়ে যেতে হবে বলেই মনে হয়। যেমন, এরই মধ্যে ব্রিটেন ভাবনাচিন্তা করছে,

আগামী শীতকালে কোভিডের আরেকপ্রস্থ ঢেউ আটকানোর জন্য তারা টিকার তৃতীয় ডোজ দেওয়া শুরু করবে। ফলে অতিমারী প্রশমনেও লাগাতার ছ-মাস অন্তর একটা করে টিকা বা ডোজ নিতে হতে পারে।

পৃথিবীতে আর কোথাও কি এই মডেল কাজ করেছে?

কিছু দেশ, যেমন ইজরায়েল ও ব্রিটেন, খুব দ্রুত অনেক মানুষকে টিকা দিতে পেরেছে। সেই সব দেশে এই মুহূর্তে সংক্রমণ বেশ কম আর তার ওপর ভরসা করে বলা হচ্ছে যে এই মডেল বেশ কাজ করছে। বাস্তবে এই ব্যাপারে খানিকটা অস্পষ্টতা আছে। সংক্রমণ সর্বত্রই পর্যায়ক্রমে বাড়ছে কমছে। তাই নিশ্চিত ভাবে এটা বলার সময় আসেনি যে কোনও দেশে এই মডেল সফল হয়েছে। বিশেষতঃ ইজরায়েল এবং ইংলন্ডের এই 'সাফল্য'-র মাস দু-তিনও কাটেনি। এই দুটি দেশের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় ঢেউ-এর উত্থান-পতনের বিস্তার ও সময় পরিসরের মধ্যে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, বা টিকাকরণের সময়ের সঙ্গে তার মিলজুল নেই, যাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে টিকার প্রভাবে পতন ত্বরান্বিত হয়েছে বা উত্থান সংক্ষেপিত হয়েছে। ইজরায়েলে যখন দ্বিতীয় ঢেউ-এর উত্থান সমাপ্ত হয় ও পতন শুরু হয় তখন দেখা যায় দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষকে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় ডোজ খুবই অল্প মানুষকে। পতন যখন শেষ হয় তখন দেখা যায় প্রায় ষাট শতাংশকে প্রথম ডোজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আর তার অর্ধেককে দ্বিতীয় ডোজ। কিন্তু ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঢেউ-এর পতন শুরুর সময় খুবই অল্প শতাংশ মানুষ প্রথম ডোজ পেয়েছিলেন, এমনকি পতন শেষ হবার সময়ও দেখা যায় মাত্র তিরিশ শতাংশ প্রথম ডোজ পেয়েছে, দ্বিতীয় ডোজ আরো অনেক কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনেক মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা মূলতঃ দ্বিতীয় ঢেউ-এর পতনের পর। ফলে অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউ-এর মোকাবিলায় গণ টিকাকরণ এই সব দেশে (যেগুলি তুলনায় বড়ো দেশ এবং দ্রুত অনেক মানুষকে টিকার আওতায় আনতে পেরেছে) কতখানি সফল তা বলা যায় না। এছাড়া, আমেরিকায় টিকা নেবার পরও আক্রান্ত হবার (পরিভাষায় ব্রেকথ্রু ইনফেকশন) তথ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে টিকা নেওয়া ও না নেওয়া লোকের ভেতর আক্রান্তের শতাংশের অনেকটা হেরফের হলেও একবার আক্রান্ত হলে তা থেকে তৈরি জটিলতায় তেমন ফারাক নেই (আক্রান্তের দশ শতাংশকে হাসপাতালে নিতে হচ্ছে, দুই শতাংশ মারা যাচ্ছে)[xii]।

সম্প্রতি কলকাতার বাঙুর হাসপাতালের একটি পরিসংখ্যান হাতে এসেছে।[xiii] তাতে দেখা যাচ্ছে, টিকা নেবার পরে যারা করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাদের মধ্যে মারা গেছেন প্রায় দশ শতাংশ (পাঁচশ' আঠারো জনের মধ্যে বাহান্ন জন)। তবে প্রথম এদের অধিকাংশই টিকার একটি ডোজ নেবার পর করোনায় আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

আমাদের কি বেশির ভাগ মানুষকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা আছে?

গত বাজেটে টিকাকরণের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ স্থির হয়েছিল। সরকারের হিসেব সত্যি হলে এখন যে দামে কেন্দ্রীয় সরকার টিকা কিনছে তাতে ভারতের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বিনামূল্যেই টিকা দিতে পারার কথা। এখানে অন্য কিছু প্রশ্ন রয়ে যায়। ভারত সরকার গত এক বছরে বিদেশের কোনও টিকার অগ্রিম বরাত দেয় নি। এখনো পর্যন্ত যে হারে ভারতে টিকা তৈরি হচ্ছে (পাঁচ মাসে তিরিশ কোটি মতো, ব্যবহার ও রপ্তানি মিলিয়ে) তাতে শুধু সেই টিকার ওপর ভরসা করে অল্প সময়ে ৬০% লোকের টিকাকরণ সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। যে কারণে আমরা সর্বত্র টিকার অভাব দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এই টিকা কর্মসূচির বাস্তব খরচটা চট করে বলতে পারা মুশকিল। মনে রাখতে হবে টিকা কেনাই একমাত্র খরচ নয়। এমনকি ১০০০ লোকের জন্য দু-ডোজ হিসেব করে ২০০০ ভ্যাক্সিন কিনলেও বাস্তবে চলবে না। যেমন আমাদের দেশে প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণ শুরু হবার পর একটা বড় অংশের টিকা ব্যবহার করতেই পারা যাচ্ছিল না। ধরুন ভায়াল খুলে ১০ টা টিকা পেলেন যেটা খোলা অবস্থায় ১০ ঘন্টা থাকবে অথচ এই ১০ ঘন্টায় এলো ৫ জন। তখন বাকি ৫ টা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। এইরকম নানা কারণে বাস্তবে কাঁটায় কাঁটায় হিসেব করে ওঠা কার্যত অসম্ভব। তবে তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে টিকাকরণের একটা বড় নেটওয়ার্ক (উৎপাদন, বন্টন, প্রদান) এমনিতেই রয়েছে তাই গণ টিকাকরণের আর্থিক দায় আমরা নিতে পারব এটা আন্দাজে বলে দেওয়া যায়। প্রশ্নটা তাই পর্যাপ্ত ট্যাঁকের জোর আছে কি নেই তা নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল আদৌ আমরা সেই টাকাটা টিকার পেছনে খরচ করব, নাকি অন্য আরো বাস্তববাদী কোনো দাওয়াই-এর পেছনে খরচ করব, তা নিয়ে। সে প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

টিকাকরণ শেষ হবার আগে পর্যন্ত লকডাউন করা কি সম্ভব?

সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ মহল থেকে জনসংখ্যার বড় অংশকে টিকাকরণ করে ওঠা পর্যন্ত লকডাউন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। হয়তো ভাইরাস বিজ্ঞান বা মহামারির বিজ্ঞান থেকে তার সপক্ষে কিছু যুক্তিও দেওয়া যায়। কিন্তু সার্বিক ভাবে আমাদের প্রশ্ন করা দরকার যে অতিমারী পর্যায়ে মানুষের জীবনধারনের বাকি যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো কি আর নেই? লকডাউনের মূল কথা হল চিকিৎসার কারণে ছাড়া বা কর্মসূত্রে বাধ্য না হলে বাড়ি থেকে না বের হওয়া। এর মধ্যে কর্মসূত্রে বাধ্য হওয়া ব্যাপারটা শুধু চাকরিজীবীদের জন্য সরল, যারা মোট রোজগেড়ের কুড়ি শতাংশও নয়। অফিস খোলা থাকলে যাবে, না থাকলে নয়। প্রথমটা বলার সময় আমরা খেয়াল রাখি না যে সমাজের একটা অংশ নানা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে রাস্তায় থাকে বলেই আরেকটা অংশের রুজি রুটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্থান হয়। রাতারাতি এই ব্যবস্থাটা বদলাবে কি করে? প্রতিটা মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনের সংস্থান নিশ্চিত না করে আংশিক বা পুরো লকডাউন করা মানে কি একটা বড় অংশের লোকের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়ে অল্প একটা অংশের জীবনের ঝুঁকি খানিকটা কমিয়ে আনা নয়? নৈতিকতায় আটকায় না? এটা কোনও ব্যক্তি মানুষের নৈতিকতার প্রশ্ন নয় রাষ্ট্রের নৈতিকতার প্রশ্ন কারণ দেশের সংবিধান সমস্ত নাগরিককে সমান অধিকার দেয়। প্রয়োজনের সংস্থান সুনিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা না করে এবং আগের লকডাউন পর্বে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক রোজগারহীনতার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে লকডাউন লম্বা করার আমরা নিন্দা করি। পয়সা নেই বললে চলবে না, কারণ গত একবছরে অতিমারীর মধ্যে ভারতবর্ষের কর্পোরেট সংস্থাগুলি মুনাফা করেছে ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা।

গণ টিকাকরণ কি ঝুঁকি মুক্ত?

গণ টিকাকরণে সংশয় শুধু তার পারা-না-পারা বা অতিমারী-মোকাবিলায়-কার্যকরীতার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। গণ টিকাকরণের একটা বড় ঝুঁকির আভাস বিজ্ঞানী মহলের নানা গবেষণায় পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি। ভাইরাল সংক্রমণ মানেই ভাইরাসে মিউটেশন বা নয়া রূপভেদ তৈরি। যদিও গঠনে একটা মাত্রা পর্যন্ত পরিবর্তন না হলে তাকে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন হিসেবে ধরা হয় না। করোনা ভাইরাসটা যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছড়িয়েছে তাতে খুব অল্প সময়ে অগুন্তি মিউটেশন করার সুযোগ পেয়েছে। ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অনেকগুলি ভাইরাল স্ট্রেইন বা রূপভেদ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে।[xiv] আরও অজস্র স্ট্রেইন তৈরি হয়ে থাকতে পারে (বা হতে যাচ্ছে) যেগুলোর হদিশ করা যায়নি। এবার ব্যাপার হল, ভাইরাসও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের আওতায় পড়ে। গণ টিকাকরণের ফলে টিকা প্রতিরোধ করতে পারে না এমন কিছু রূপভেদ-কে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে একটা সুবিধে দিয়ে ফেলতে পারি, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত অন্য রূপভেদগুলিকে, যেগুলিকে টিকা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, সেগুলিকে আটকে দিয়ে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত একটি খসড়া গবেষণাপত্রে (ইজরায়েলের) সেরকম যে ঘটছে তার খুবই প্রাথমিক ইঙ্গিত রয়েছে।[xv] সেক্ষেত্রে শুধু যে টিকাকরণ কোনও কাজে আসবে না তাই নয়, আমাদের সামনে এসে পড়তে পারে এমন একটা ভাইরাস রূপভেদ যার বিরুদ্ধে আমাদের আমাদের কোনোরকম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই ঠিক করে কাজ করবে না। এই ভাইরাস রূপভেদটির মারণ ক্ষমতা কত হবে ইত্যাদি আগে থেকে বলা সম্ভব না কিন্তু অনেক বেশি হলেও আমাদের হাতে প্রায় কিছুই পড়ে থাকবে না। এই ঝুঁকিটা গণ টিকাকরণে বাস্তবে কতটা আছে তাই নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে ঐকমত্য নেই। তবে সম্ভাবনাটা কেউ একদম উড়িয়ে দিতে পারেন না। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, গণ টিকাকরণ যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকে আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে, তেমনি প্রাকৃতিক সংক্রমণও তো তা করতে পারে, তাই না? প্রাথমিক গবেষণার ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, প্রাকৃতিক সংক্রমণ তথা আক্রমণ কোনো ব্যক্তির শরীরে দীর্ঘস্থায়ী (সাধারণতঃ সহজাত প্রতিরোধক্ষমতা খুব কম থাকার কারণে বা স্টেরয়েডের প্রয়োগে তা কৃত্রিমভাবে কমিয়ে দেবার কারণে), অথচ সে হাসপাতাল পরিষেবার অন্তরীণে পৃথকভাবে না থেকে জনসমাজের মধ্যে থাকছে বা এমন হাসপাতালে থাকছে যেখানে ছোঁয়াছুঁয়ি মানা হচ্ছে না ঠিকমতো, এরকম ঘটনায় মিউটান্ট স্ট্রেনের প্রাকৃতিক নির্বাচন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকে পৌঁছতে পারে।[xvi] এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, প্রাথমিক গবেষণার ভিত্তিতে এটাও অনুমান করা যায় যে নানা অ্যান্টিভাইরাল থেরাপির (যেমন প্লাজমা থেরাপি) বেঠিক প্রয়োগেও মিউটান্ট স্ট্রেনের প্রাকৃতিক নির্বাচন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকে পৌঁছতে পারে।[xvii]

একথা কখনই আগে থেকে বলা সম্ভব নয় যে গণ টিকাকরণের ফলে (অথবা নানা চিকিৎসার ভুলে বা অবহেলায়) আমরা আরও বেশি মারণক্ষমতা যুক্ত একটা ভাইরাস রূপভেদের সামনে এসে পড়ব। এমনকি দ্বিতীয় ঢেউ-এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে যে রূপভেদগুলিকে, সেগুলির প্রাকৃতিক নির্বাচনে আমাদের নানা প্রচেষ্টার ভূমিকা আদৌ আছে কি না বা থাকলে কতটা সেসব নিয়েও বিশদ গবেষণা এখনও নেই। তবে একই শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসগুলোর ক্ষেত্রে টিকাকরণের অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়। প্রতিবছর নতুন নতুন টিকা নিতে হয়, এমনকি তার পরেও ইনফ্লুয়েঞ্জা কার্যতঃ অনেকটাই আটকানো যায় না। একই অভিজ্ঞতা যদি নতুন করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের হয় তবে সম্ভবতঃ তার অনেক বড় মাশুল এমনিতেই দিতে

হবে কারণ সাধারণ ফ্লুর তুলনায় কোভিডের মারণ ক্ষমতা বেশি। তা ছাড়া একই শ্রেণীতে অনেক গুণ বেশি মারণ ক্ষমতা যুক্ত ভাইরাসও (MARS) দেখেছি আমরা আগে। কাজেই ব্যাপারটা খানিকটা বোতল বন্দি জিনের মত, একবার বেরিয়ে এলে তার মোকাবিলা আমরা কতটা ও কতদিনে করে উঠতে পারব এটা নিশ্চিত ভাবে আগে থেকে বলার কোনও উপায় নেই। অতএব এই ঝুঁকিকে খাটো করে দেখা ঠিক নয়।[xviii]

আমরা কি এই মুহূর্তে গণ টিকাকরণকে পাখির চোখ করব না?

ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে অতিমারীর ঢেউ এখন গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে। বাস্তবে দেশের যে কোনও রাজ্যে বড় শহর থেকে যত দূরে যাওয়া যায় সবরকম সরকারি পরিষেবা আর পরিকাঠামো উধাও হয়ে আসে। তাই গণ টিকাকরণ যদি নিতান্তই জরুরিও হয় তবুও দেশের প্রতিটি কোনায় তার সুফল পৌঁছে দেওয়া সময়সাপেক্ষ ও দুঃসাধ্য। তাই বাস্তবে শুধু গণ টিকাকরণের ওপর জোর দিয়ে সরকারের ওপর চাপ বাড়ানো হলে আর্থসামাজিক নানা শ্রেণীর লোকের জন্য অসম ঝুঁকির একটা পরিবেশ তৈরি করা হবে। টিকাকরণের পাশাপাশি একদম স্থানীয় স্তরের সমস্যাগুলোর ওপর নজর না দেওয়া গেলে এই অতিমারী পার করা কঠিন হবে। যেমন গ্রামের লোকজন অক্সিমিটার জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার বা সংস্থান করতে পারেন না, গ্রামে সাধারণ ভাবে জীবনদায়ী অক্সিজেনের ব্যবস্থা প্রায় নেই কারণ আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা শহর নির্ভর। অথচ আমাদের দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থাকে আমরা কি যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারছি? এইসব প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে অতিমারীর দোহাই দিয়ে শুধুমাত্র গণ টিকাকরণের জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া খানিকটা দায় ঝেড়ে ফেলার মত। ভেবে দেখা যেতে পারে, গণ টিকাকরণ নাকি স্থানীয় স্তরে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নির্মাণ ও যথাযথ চিকিৎসাপদ্ধতি -- কোনটাতে জোর দেওয়া বেশি দরকার। আমাদের বিচারবুদ্ধি বলে -- দ্বিতীয়টিতে।

গণ টিকাকরণ ছাড়া আর কোনও উপায় কি আদৌ আছে?

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে অতিমারী মোকাবিলার কোন নির্দিষ্ট উপায় এই মুহূর্তে হাতে নেই। আগের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, গণ টিকাকরণকেও সেই অব্যর্থ উপায় বলে ধরে নেবার কোনও যুক্তি নেই। তাই প্রশ্নটাকেই আমাদের একটু অন্যভাবে করা দরকার। এই মুহূর্তে সব মহলেই আমরা দেখছি যে গণ টিকাকরণকে একমাত্র উপায় হিসেবে দেখানোর একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতাটার আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমালোচনা করছি। মূল সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার, এমনকি আড়াল করার একটি অপচেষ্টা বলে এটাকে চিহ্নিত করছি। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দৈন্য, ভুল চিকিৎসা ও অপচিকিৎসা, বেরোজগারি, অশিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক প্রায় সব ক্ষেত্রে একটা সমন্বয়ের অভাব চোখে পড়ছে। এই ব্যাপারগুলো নস্যাৎ করে দিয়ে শুধু গণ টিকাকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এমনকি শুধু সেটুকুও কতটা ভাল ভাবে করা যাবে তাতে সংশয় আছে। তুলনায়, অতিমারীর অবকাশে পাড়াস্তরে ন্যুনতম স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করার সুযোগ এসেছে, যেখানে পাড়ার বারোয়ারি জায়গায় থাকবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অক্সিজেন, ফ্লো-মিটার, বেড, নানা মৌলিক পরীক্ষাযন্ত্র (থার্মোমিটার বা তাপমাপক

যন্ত্র, অক্সিমিটার, রক্তচাপ ও রক্তে শর্করা মাপার যন্ত্র, এক্স-রে মেশিন ইত্যাদি), প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী। সরাসরি হলে সবচেয়ে ভালো, নইলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা দেখভাল করবেন উচ্চপ্রশিক্ষিত ডাক্তাররা। সরকারের অর্থ ও উদ্যোগ বরং ব্যয় হোক এইটাতে। এছাড়াও নিয়মিত রক্তসমীক্ষা ও নতুন স্ট্রেন বা রূপের সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহের ভাইরাসের জিনসমীক্ষা বহুগুণ বাড়ানো প্রয়োজন অতিমারী মোকাবিলায়। সর্বোপরি প্রয়োজন কোভিড হয়েছে কি না টেস্ট করার সহজ ও সুলভ পরিকাঠামো। এছাড়া সামগ্রিকভাবে কোভিডের চিকিৎসাপদ্ধতি-ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে ভুল চিকিৎসা, অপচিকিৎসা ও রোগীর-পকেট-কাটা-চিকিৎসার সম্ভবনা কমে।

তবে কি আমরা টিকা নেব না?

এই মুহূর্তে ইচ্ছুক ব্যক্তির টিকাকরণের বিরোধিতা করার কোনও যুক্তি নেই। আবার একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে টিকা নিতে বাধ্য করার কোনও কারণ নেই। এমনকি কথায় কথায় 'টিকা ছাড়া বাঁচার পথ নেই' কথাটা আওড়ানোয় একভাবে টিকা নিতে বাধ্য করা। যা দাঁড়িয়ে গেছে -- টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাক বা নাই থাক এই মুহূর্তে ঘরে বন্দি থাকা ছাড়া ব্যক্তি হিসেবে অতিমারী এড়াতে করণীয় বলতে ব্যক্তির হাতে আছেই তো শুধু টিকা নেওয়া। তা এক মানসিক বলপ্রদানকারীও বটে। মোটামুটি ভাবে এইসব টিকা স্বল্পমেয়াদে কোনো ক্ষতি করছে না, সম্ভবনা অর্থে। দীর্ঘকালীন কোনও ক্ষতি করছে কিনা সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছু নেই। আমরা কেউ সমাজ নিরপেক্ষ জীবন কাটাই না। তাই নিজে টিকা নেব কি না বা প্রিয়জনকে টিকা নিতে বলবো কিনা এটা একটা সামাজিক প্রশ্নও হয়ে ওঠে, শুধু ব্যক্তির নিজের ব্যাপার থাকে না। টিকার সুবিধে অসুবিধে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকলে, তারপর, ব্যক্তি মানুষ টিকা নেবে কি না, নাকি সে প্রাকৃতিক সংক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবে বুকে বল নিয়ে, নাকি সে একবার রক্তপরীক্ষা করে দেখবে যে তার দেহে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধক্ষমতা (অ্যান্টিবডি) এরইমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে কি না বা আছে কি না, অজান্তেই কোনো সংক্রমণের মধ্যে দিয়ে বা পূর্বে আক্রান্ত হবার ঘটনার মধ্যে দিয়ে -- এটা নিতান্তই তার নিজের ও তার প্রিয়জনদের মধ্যেকার টানাপোড়েনের ব্যাপার। তবে সে টিকা নিয়ে নিলেও গণ টিকাকরণের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ সম্পূর্ণ বোধবুদ্ধির ব্যাপার, দ্বিচারিতা বা সুবিধাবাদ নয় মোটেও। আবার নিজে টিকা না নিয়ে গণ টিকাকরণের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশও মোটেই অবস্থানগত হওয়া উচিত নয়, বোধবুদ্ধিগত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা সাধারণ ভাবে টিকার বিরোধী নই, যদিও যতখানি নিশ্চয়তার সাথে টিকার সাফল্য প্রচারিত হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপদ্ধতি আমাদের ততটা নিশ্চিত হতে দিচ্ছে না। আমাদের আশংকা এই যে, গণ টিকাকরণের ওপর জোর দিতে গিয়ে আমরা অনেক সমান বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে অবহেলা করে একটা অনাবশ্যক সুবিধাবাদী অবস্থান নিয়ে ফেলতে পারি।

---

i DOI: 10.4103/ijmr.IJMR_3290_20

ii DOI: 10.1038/s41591-020-0965-6

iii Naushin et al, 2021

iv https://www.downtoearth.org.in/news/health/icmr-sero-survey-finds-antibodies-in-only-21-5-indians-75386

v https://www.livemint.com/news/india/mumbai-sero-prevalence-of-57-found-in-slums-and-16-in-residential-societies-11595952896909.html

vi doi: 10.1136/bmj.n1088

vii https://doi.org/10.1101/2021.04.04.21254881

viii Immunity and Covid-19, British Society for Immunology, 3 february 2021

ix https://doi.org/10.1038/s41586-021-03681-2

x doi: 10.1056/NEJMoa2101765, doi: 10.1136/bmj.n1088

xi https://doi.org/10.1038/s41467-021-23761-1

xii http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7021e3

xiii বর্তমান, ১০ জুন

xiv DOI 10.1099/jgv.0.001584

xv https://doi.org/10.1101/2021.04.06.21254882 ;

xvi Rambaut A, Loman N, Pybus O, Barclay W, Barrett J et al. Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations. virological.org 2020

xvii https://doi.org/10.1101/2020.12.05.20241927

xviii https://www.statnews.com/2021/01/04/britain-takes-a-gamble-with-covid-19-vaccines-upping-the-stakes-for-the-rest-of-us/